ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু ৮

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেশাদার পরামর্শক থাকা বাঞ্ছনীয়

বেশির ভাগ ব্যক্তিই আত্মহত্যার সময় কোনো না কোনো গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শারীরিক ও মানসিক যেকোনো অসুস্থতায় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ আত্মহত্যার প্রবণতা কমায়। পাশাপাশি আত্মহত্যা প্রতিরোধে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে প্রটেকটিভ ফ্যাক্টর বা রক্ষাকারী বিষয় বলা হয়। যেমন–জীবনের খারাপ সময়গুলোতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মানো, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস জন্মানো, সমস্যা সমাধানের কার্যকর দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে ইতিবাচক সহায়তা লাভের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

পত্রিকার পাতা খুললে প্রায়ই চোখে পড়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যাসংক্রান্ত খবরাখবর। তা ছাড়া ভালোভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থীই হতাশা, মানসিক অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে। সংগত নানা কারণে আগের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে এ অবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাসহ আত্মহত্যা চেষ্টার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চললেও দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নেই কোনো পেশাদার পরামর্শক বা কাউন্সেলর। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হতাশা ও মানসিক অশান্তি থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাদার পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলর নিয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার চেষ্টা চালানো কিংবা আত্মহত্যা করার প্রবণতাসহ তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা অনেকটাই কমে আসবে। এ কথা ধ্রুব সত্য যে একজন শিক্ষার্থীকে স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আসতে তার অভিভাবকসহ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম করতে হয়। পাড়ি দিতে হয় অনেক দুর্গম ও বন্ধুর পথ। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই স্মরণ রাখা উচিত, অনেক আশা-ভরসা নিয়ে তাদের মা-বাবা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠান। পাশাপাশি দেশ-জাতিও তাদের কাছ থেকে ভালো অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। এ কথা সত্য, মানুষের জীবনেই সমস্যা আসে এবং সমস্যা আসবেই–এটিই স্বাভাবিক। তার মানে এই নয় যে জীবনে সমস্যা এলে বা সমস্যায় পড়লে আত্মহত্যা করে জীবনকে শেষ করে দিতে হবে বা আত্মহত্যার চেষ্টা চালাতে হবে। বরং জীবনে সমস্যা এলে বা সমস্যায় পড়লে শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আবেগনির্ভর না হয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে বাস্তবতার আলোকে সেই সমস্যার সমাধান করা উচিত বা সেই সমস্যা প্রতিহত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার কোনো কাউন্সেলরেরও শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী বা অন্য কেউ যখন আত্মহত্যা করে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করে তখন স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে এটি তার মানসিক অস্থিরতা বা আবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়ার ফলাফল। বলা বাহুল্য, আত্মহত্যা হচ্ছে মানবজীবনের এক চরম অসহায়ত্ব। ক্ষণিক আবেগে একটি মহামূল্যবান জীবনের চির অবসান ঘটানো, যা কোনো কিছুর বিনিময়েই এবং কোনোভাবেই ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। আর আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের মূল্যবান জীবনকে যেমন একদিকে শেষ করে দেওয়া হয়, তেমনি অন্যদিকে একটি সম্ভাবনারও চির অবসান ঘটে। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে 'আত্মহত্যা' নামক এই মহাপাপ সংঘটিত হয়ে আসছে এবং এটিকে কোনো দেশ কিংবা কোনো সমাজ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না। কোনো ব্যক্তির আত্মহত্যা করার পেছনে যেসব কারণ নিহিত থাকে তার মধ্যে রয়েছে বিষণ্নতা বা Depression, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সমস্যা কিংবা নিতান্ত ব্যক্তিগত মনঃকষ্ট, বাইপোলার ডিস-অর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া (দীর্ঘদিন ধরে ব্যর্থতা, গ্লানি বা হতাশা এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ, নিঃসঙ্গতা, কর্মব্যস্ততাহীন দিন যাপন ইত্যাদি মানবমস্তিষ্ককে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত করে), পার্সোনালিটি ডিস-অর্ডার, অ্যাংজাইটি ডিস-অর্ডার, অ্যালকোহল ব্যবহারজনিত ডিস-অর্ডার ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পরিসংখ্যান মতে, বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১২১ মিলিয়ন মানুষ মাত্রাতিরিক্ত বিষণ্নতার শিকার। WHO-এর বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, ২০২০ সালের মধ্যে হৃদ্‌রোগের পরেই বিষণ্নতা মানবসমাজের বিপন্নতার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হবে। WHO-এর জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে বার্ষিক আত্মহত্যার হার ১১.৪ শতাংশ। জরিপে দেখা যায়, শুধু ২০১২ সালে সারা বিশ্বে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে আট লাখ চার হাজারটি। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একটি করে আত্মহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। তবে এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। আর বাংলাদেশে বার্ষিক আত্মহত্যার সংখ্যা গড়ে ১০ হাজার ২২০টি, যার মধ্যে ৫৮ থেকে ৭৩ শতাংশ আত্মহত্যাকারীই নারী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মহত্যার পেছনে কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে : পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া, সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটা, অপরিসীম অর্থকষ্ট, যৌন, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন-নিপীড়ন, মাদকাসক্তিসংক্রান্ত সমস্যা, নানা ধরনের মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি রয়েছে পরিবারের সদস্য বা নিকটাত্মীয়, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবী কিংবা প্রিয় কোনো নেতা, অভিনেতা, শিল্পী, খেলোয়াড়ের আকস্মিক মৃত্যু বা আত্মহত্যার সংবাদ, কর্মস্থল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকর্মী বা সহপাঠীদের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া, দীর্ঘদিনের বেকারত্ব বা হঠাৎ চাকরিচ্যুতি বা চাকরিতে পদাবনতি ঘটা, 'এ পৃথিবীতে কেউ আমাকে চায় না' বা 'আমি সবার বোঝাস্বরূপ' কিংবা 'আমি পরিবারের কলঙ্ক' বা 'এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আমার কোনো লাভ নেই'–এজাতীয় বদ্ধমূল চিন্তা ইত্যাদি। এসব চিন্তার ফলে মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া প্রচণ্ড রকমের হতাশা ও ক্ষোভের কারণে মানুষ তার নিজের প্রতি আস্থা ও সম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে। আর তখন থেকেই সে সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে এবং একসময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার কিছু ব্যর্থতাও মানুষকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছে এবং এসংক্রান্ত খবরাখবর প্রায় সময়ই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ও আত্মহত্যা চেষ্টার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চললেও এবং তাদের অনেকেই মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতায় ভুগলেও আজ পর্যন্ত দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নেই কোনো পেশাদার পরামর্শক বা কাউন্সেলর। বলা বাহুল্য, আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর বেশির ভাগই প্রতিরোধযোগ্য। বেশির ভাগ ব্যক্তিই আত্মহত্যার সময় কোনো না কোনো গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শারীরিক ও মানসিক যেকোনো অসুস্থতায় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ আত্মহত্যার প্রবণতা কমায়। পাশাপাশি আত্মহত্যা প্রতিরোধে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে প্রটেকটিভ ফ্যাক্টর বা রক্ষাকারী বিষয় বলা হয়। যেমন–জীবনের খারাপ সময়গুলোতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মানো, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস জন্মানো, সমস্যা সমাধানের কার্যকর দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে ইতিবাচক সহায়তা লাভের চেষ্টা করা ইত্যাদি। এসব ফ্যাক্টরকে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে রক্ষাকারী বা প্রতিরোধী বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তা ছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, অনুশাসন, ভালো বন্ধু, প্রতিবেশী ও সহকর্মীর সঙ্গে সামাজিক সুসম্পর্ক প্রভৃতি আত্মহত্যার প্রবণতা হ্রাসে সহায়তা করে। তা ছাড়া সুষম খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত নিদ্রা, নিয়মিত শরীরচর্চা, ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা তথা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং শারীরিক ও মানসিক যেকোনো অসুস্থতায় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ আত্মহত্যার প্রবণতা কমায়।

সুতরাং শিক্ষার্থীদের হতাশা ও মানসিক অশান্তি থেকে উত্তরণের জন্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্রুত পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগ করা প্রয়োজন। আর তা সম্ভব হলেই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার চেষ্টা চালানো কিংবা আত্মহত্যা করার প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আত্মহত্যা যে মহাপাপ এবং আত্মহত্যার বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরে নিয়মিতভাবে তার প্রচার-প্রচারণারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সর্বোপরি শিক্ষার্থীসহ সবাইকেই জীবনের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে বুঝতে হবে। তাদের বুঝতে হবে, জীবন একটিই এবং তা মহামূল্যবান। জীবন একবার হারালে আর কোনো লাভ বিনিময়েই ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সবারই স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জীবনটিকে যদি সুন্দরভাবে সাজানো যায়, তাহলে একে সুন্দরভাবে উপভোগও করা যায়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি;
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক সদস্য
kekbabu@yahoo.com